International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

বাংলা কথাসাহিত্যে মহামারি ,কোভিড ১৯ এবং কয়েকটি বাংলা ছোটোগল্প

বৈজয়ন্তী মুখোপাধ্যায়[1], সুমিতা চক্রবর্তী[2]

[1]গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি
[2]তত্ত্বাবধায়ক, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ:

একবিংশ শতাব্দীর ২০২০ থেকে২০২৩ -এর মধ্যে যে ভাইরাস গোটা পৃথিবীকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল তার নাম 'করোনা ভাইরাস ডিজিজ' , সংক্ষেপে 'কোভিড'। ২০১৯-এ এই সংক্রমণ প্রথম দেখা গিয়েছিল বলে রোগের নামকরণ করা হয়েছে 'কোভিড ১৯'। ফুসফুসের সংক্রমণ এবং প্রবল শ্বাসকষ্টের ফলে মৃত্যু হয় এই রোগে। ভারতের মতো দরিদ্র দেশে এই সংক্রমণের ফলে সর্বস্তরের বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল।

সাহিত্যে সমাজের বাস্তবতাকেই তুলে ধরা হয়। বাংলা কথাসাহিত্যে করোনা মহামারিতে আক্রান্ত মানুষের নানা ধরনের বিপন্নতার ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে বাংলা ছোটোগল্পে কোভিডের স্বরূপ ও প্রতিক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গে করোনা মহামারির অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে যে-সমস্ত ছোটোগল্পে, সেগুলিকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করেছি— ১) বিচ্ছিন্নতার সমস্যা(শেষ দৃশ্যের খসড়া-তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-২০২১), ২) জীবিকার সমস্যা(' সব্জিওয়ালার ছেলে'-সমীর গোস্বামী-২০২২), ৩) অজ্ঞানতার সমস্যা('কোভিড সমাচার বাই কমলি-সায়ন্তনী পূততুন্ড-২০২০), ৪) পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা('পরিযায়ী'-সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়-২০২২)। সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার সংগ্রামী প্রচেষ্টাও লক্ষ করি আমরা গল্পগুলিতে। সর্বোপরি করোনা মহামারির তীব্র নেতিবাচকতার মধ্যেও ইতিবাচকতার সন্ধান পাওয়া যায়—যেমন করোনা আমাদের সেই সতর্কবার্তা শুনিয়ে গেছে যে সে হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ — এখনও সাবধান না হলে মানবজাতির ধ্বংসের আর বেশি বিলম্ব নেই।

সুচক শব্দ : মহামারি, লকডাউন, একুশ শতক, কোভিড১৯, মাস্ক, বিচ্ছিন্নতা, জীবিকা, চিকিৎসক, হাসপাতাল, সতর্কতা

সম্পূর্ণ গবেষণাপত্র:

একবিংশ শতাব্দীর দু-বছর ধরে সারা পৃথিবীব্যাপী যে কোভিড ১৯ মহামারি ঘটে গেছে তা সমগ্র মানবজাতিকে একপ্রকার স্তব্ধ করে দিয়েছিল।করোনা ভাইরাসের আক্রমণের তীব্রতা সবচেয়ে গভীরে পৌঁছেছিল ২০২০-২১ –এ।তারপরে করোনার টিকা আবিষ্কারের ফলে আক্রমণ অনেকটাই কমে এলেও, এখনো এই রোগের সংক্রমণ পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায়নি।

‘ করোনা ভাইরাস’ বা ‘কোভিড ১৯’ এক ভয়াবহ সংক্রামক রোগের চেহারা নিয়ে প্রথম পৃথিবীতে দেখা দেয় একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে। এই রোগের নামের মধ্যেই রোগটির প্রথম আবির্ভাবের বছরটি(২০১৯) চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই রোগের প্রধান সংকট হল মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ।প্রধান লক্ষণ হল শ্বাসকষ্ট এবং জ্বর। একেবারে প্রথম ধাপেই চিকিৎসা না হলে রোগ দ্রুত বেড়ে যায় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু হয়। মানুষের সভ্যতায় রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্ভবও হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। প্রতিনিয়তই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা চলে এবং নতুন নতুন প্রতিষেধকের আবিষ্কারও হয়। এভাবেই একসময়ের কঠিন মহামারির প্রকোপ,যেমন-প্লেগ,বসন্ত,কলেরা, ম্যালেরিয়া— এখন অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু কোভিড১৯-এর কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে এর আগে কিছু জানা ছিল না বলে রোগের প্রতিষেধক এতকাল আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বব্যাপী চিকিৎসকদের ও চিকিৎসাশাস্ত্রবিদদের প্রচেষ্টায় প্রতিষেধকের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে কোভিড১৯ মহামারি অন্যান্য রোগের মতোই নিশ্চিহ্ন না হলেও অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত।

সাহিত্যে সমগ্র বিশ্বেই এই রোগের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন দিক স্থান পেয়েছে।এই নিবন্ধে আমরা ছোটোগল্পের আলোচনাতেই নিবদ্ধ থাকব।

এই করোনা মহামারিকেন্দ্রিক গল্পগুলি মূলত লেখা হয়েছে ২০২০ থেকে ২০২৩ -এর মধ্যে। এই অংশটি বাংলাসাহিত্যে একটি বিশেষ সময়ের মহামারির প্রত্যক্ষ প্রতিফলনকে ধারণ করে আছে। এই প্রতিফলনের আছে বিভিন্ন দিক—সামাজিক,অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। সেই দিক থেকে এই পর্বের বাংলা কথাসাহিত্য ভবিষ্যতে একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে গ্রাহ্য হবে। এই গল্পগুলিতে রোগজনিত সব ধরনের সমস্যা—যেমন চাকুরিজীবীর চাকরি চলে যাওয়া;নতুন জীবিকার সন্ধান;বিচ্ছিন্নতা,হতাশা ও আত্মহত্যার প্রবণতা;পরিযায়ী শ্রমিকের সমস্যা;চিকিৎসা ও হাসপাতালের বিবরণ ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে। সেই সঙ্গে দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে মানুষের আপ্রাণ সংগ্রামের দিকটিও পরিস্ফুট হয়েছে।কোথাও মানুষ পরাজিত হয়েছে; কোথাও উত্তীর্ণ হয়েছে।কিন্তু যেখানে পরাজয় সেখানেও মানুষের সংগ্রামের সত্য অস্বীকার করা যায় না।একই সঙ্গে মানুষের মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন প্রচ্ছায়—ভয়,অসহায়তা,স্বার্থপরতা,নির্বুদ্ধিতা,অজ্ঞানতা এবং প্রতিরোধ শক্তিরও চিহ্ন আছে গল্পগুলিতে। সর্বোপরি বলা যায়, অনেক রোগই সভ্যতার অগ্রগতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। শোষণ এবং পরিবেশ দূষণের ফলে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে।এসবই এসেছে গল্পগুলিতে।

এজাতীয় গল্পের সংখ্যা প্রচুর। বিস্তৃত পর্যালোচনার দৃষ্টান্ত রূপে কয়েকটি গল্পকে আমরা নির্বাচন করেছি। বাংলা ভাষা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশেরও ভাষা এবং কোভিড মহামারির বিস্তার যেহেতু সারা পৃথিবীর মতোই বাংলাদেশেও ঘটেছে,সেজন্য বাংলা ছোটোগল্পের দৃষ্টান্তরূপে বাংলাদেশের সাহিত্যের দিকেও আমরা দৃষ্টিপাত করেছি।বিস্তৃত পর্যালোচনার জন্য আমরা নির্বাচন করেছি পশ্চিমবঙ্গের তিনটি গল্প এবং বাংলাদেশের দু’টি গল্প।

২০২০ –তে সায়ন্তনী পূততুন্ড-র লেখা ‘কোভিড সমাচার বাই কমলি’। গল্পকথক এখানে কমলি। হাস্যরসের ভঙ্গিতে লেখা গল্পটিতে কমলির কোনও স্পষ্ট পরিচয় নেই,একবার ‘বিল্লিরানি’ এবং একবার ‘ ম্যাঁও...ম্যাঁও’ ধ্বনির উচ্চারণে বোঝা যায় সে একটি পোষা বেড়াল । এই বেড়াল-কমলি যেন কোভিড সম্পর্কে বর্ণনা করেছে নিজের অভিজ্ঞতা । হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর বিড়ালটির ছায়া পড়েছে এখানে।কমলি দেখছে করোনাকে অনেকেই নিজের মতো বুঝে নিয়েছেন; বিজ্ঞানী,গবেষক,চিকিৎসকদের কথাকে তারা মোটেও আমল দিচ্ছে না :

'কেউ বলছেন পবিত্র কোরাণ হইতে কোরোনা উদ্ভূত।'[১]

কেউ বলছেন করোনা যেহেতু চিন থেকে ছড়িয়েছে তাই সেই চাইনিজ করোনা জুতসই নয়। এই বিশেষজ্ঞদের কমলি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকের আবার অভিমত— করোনা হচ্ছে কর্ণের নতুন অবতার:

' মুশকিল হইল কর্ণ আবার সূর্যপুত্র।তাই রাত্রিবেলায় সূর্যকে উবজাইয়া দীপ তুবড়ি মোমবাতি জ্বালাইয়া উহার সঙ্গে কর্ণপটহ বিদীর্ণকারক পটকা ফোটাতে শুরু করল।'[২]

অনেকেই ,সাধারণ মানুষেরা, করোনার নানারকম চিকিৎসা শুরু করল:

'দুচারটি গালভরা নাম কণ্ঠস্থ করিয়া বসিয়া থাকিব। আর কোভিড উড়ুম্বর খাগড়া নৃত্য করিতে করিতে কহিব,প্রোসিডেনশিয়া,রাইনোরিয়া সহযোগে হরিপাইলেশন হইয়াছে! হরি! হরি! হরিপাইলেশন অর্থাৎ হরির হইতে লেসন পাইয়াছেন।[৩]

কেউ বললেন ,গোমূত্র করোনার একমাত্র ওষুধ। কেউ বলছেন গরম জলের চা পান করলে করোনা থাকবে না। আবার কেউ বলছেন ,তামাক খেলে করোনা হয় না। এই কথায় ধূমপানকারীরা খুশি হয়ে ধূমপান বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে মিডিয়া ,লকডাউনে বাড়িতে অভিনেতা অভিনেত্রীরা কে কী করছেন তাই দেখাতে ব্যস্ত:

' কোন্ অভিনেতা ঘর মুছিয়া ন্যাতা হইয়াছেন,আর কোন্ অভিনেত্রী সম্বরাবিহীন স্বাস্থ্যকর ডাল রাঁধিতেছেন উহাই বিবেচ্য বিষয়।... ওদিকে কত মানুষের ঘরে অন্ন নাই তাহার খবর কে দেয়! '[৪]

চারিদিকে মৃত্যুমিছিল,করোনায় অসুস্থ মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে চিকিৎসকদের হারাচ্ছি আমরা,যেখানে অন্যদেশের চিকিৎসকরা করোনা রোগীর চিকিৎসা করার সময় নিজেদের বাঁচাবার জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম পাচ্ছেন সেখানে আমাদের দেশের ডাক্তাররা শুধু মনের জোরে নিরস্ত্র অবস্থায় কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মতো এ গল্পের কথকেরও মনে হয় , নেশায় বুঁদ হতে পারলে দেশের কাছ থেকে এইসব না-পাওয়ার কথা হয়ত ভুলে থাকা যাবে -ভুলে থাকা যাবে উপবাসী শুষ্ক মুখগুলি,ভুলে থাকা যাবে নিরন্ন মানুষের হাহাকার।করোনা হয়ত একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে কিন্তু যে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার ভারতবাসীকে তমসাচ্ছন্ন করে রেখেছে তা থেকে তার মুক্তি আসবে কবে?

সমীর গোস্বামীর 'সব্জিওয়ালার ছেলে'('আজকাল',২০২১) গল্পটি করোনার মহামারিতে যে জীবিকার সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাই নিয়ে লেখা। গল্পের নায়ক অরূপের লকডাউনে চাকরিটি চলে যায়। স্ত্রী, পুত্র, মাকে নিয়ে অথৈ জলে পড়ে সে। বাড়িতে ঢুকে স্ত্রী ছন্দাকে এই ভয়ঙ্কর কথা জানালে ছন্দা বিমূঢ় হয়ে যায়। তারা এমতাবস্থায় কী করবে ভেবে পায়না। বৃদ্ধা মাকে কিছু জানায় না। সংসারের বাড়তি খরচ কমানোর চেষ্টা করে। চাকরি আর পাওয়া যাবে না এটা ভালোই বুঝতে পেরে অরূপ প্রস্তাব দেয় যে , সে সব্জি বিক্রি করবে। ছন্দা এটিকে তার সামাজিক অবস্থানের পতন হিসাবেই দেখে। কিন্তু চারটে প্রাণীর পেট চলবেই বা কেমন করে।

অরূপ বা ছন্দা মাকে এই দুরবস্থার কথা না জানালেও , মা একসময় তা জেনেই যান। তিনি তাঁকে কোনও ধর্মীয় আশ্রমে রেখে আসবার প্রস্তাব দেন অরূপকে, তাতে যদি কিছু সাশ্রয় হয়। অরূপ যদিও তা শোনে না।

শেষে সব্জি বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। পরদিন বাড়ির রোয়াকে যখন সবজি নিয়ে বসছে অরূপ, তখনই তার মা মারা যান। মুখাগ্নি করে ফেরার সময় অরূপের মনে হয় যে , এটুকুই ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে , তার মাকে সব্জিওয়ালা ছেলেকে আর দেখে যেতে হল না:

" 'দাহ করে ফিরতে ফিরতে প্রায় ভোররাত। বাড়ি ঢুকে অরূপ চুপ করে বসে আছে। ছোটবেলা থেকে মা-বাবার কথা মনে পড়ছে।

ছন্দা এসে জিজ্ঞেস করল, ' তুমি তো কাল সকালে এক কাপ চা-বিস্কুট ছাড়া আর তো কিছুই খাও নি ! এখন কিছু মুখে দেবে? নইলে তো শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

অরূপ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল,'জানো ,মা-কে আর সব্জিওয়ালা ছেলেকে দেখে যেতে হল না।' "[৫]

কিন্তু এখানে পাঠক হিসাবে আমাদের কিছু বলার আছে। লেখক গল্পটিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যেন যাঁরা সব্জি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। কোনো পেশাকেই যে ছোটো বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না, সমাজে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি পরিষেবা যাঁরা দেন, আমাদের বেঁচে থাকাকে অনায়াস করে তোলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যে সমান স্তরে অবস্থান করেন – এই ব্যাপারটা লেখক প্রতিষ্ঠিত না করে মধ্যবিত্তের মেকি ইগোকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, যা থেকে পাঠকের মন কোনও ইতিবাচকতায় যাত্রা করে না।

জীবিকার সমস্যা আসলে অর্থনৈতিক সমস্যারই একটি রূপ। করোনা মহামারি যে ঐ সময় অনেক সংসারের অর্থনৈতিক ভিত টলিয়ে দিয়েছিল 'সব্জিওয়ালার ছেলে' গল্পটি তারই এক প্রতিচ্ছবি।

বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শেষ দৃশ্যের খসড়া'(উশ্রী পত্রিকা,২০২১) গল্পটিও এই সময়ে লেখা। মানুষ সভ্যতার নামে পৃথিবীকে কীভাবে ধ্বংস করছে—তারই এক ছবি এঁকেছেন লেখক এই গল্পে। মানুষের সমানে বেড়ে চলা লোভের ভার ধরিত্রী আর বহন করতে পারছে না ,তাই যেন করোনা মহামারির আবির্ভাব ,যা সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে যাবে।

'বিশাল আকাশচুম্বীটার ঊনচল্লিশতম তলায় একটি ফোর-রুম ফ্ল্যাটের একটি পেল্লায় ঘরের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙল মানবের। ... আর একটু পরেই ড্রাইভার এসে আগমন-সংবাদ জানান দেবে মোবাইলে মিসড্ কল দিয়ে। খুব দ্রুত তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ড্রাইভারের জন্য,কিন্তু সাতটা চল্লিশ হয়ে গেল তার পাত্তা নেই। আরও মিনিট দুয়েক পরে নিজেই একটা ফোন করল ড্রাইভার মিশেলকে।আশ্চর্য হয়ে শুনল ওপাশে বলছে,সুইচ অফ।'[৬]

আরও দশমিনিট অপেক্ষা করেও যখন ড্রাইভার এল না তখন গল্পের নায়ক মানব অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাস্তায় একটিও লোক নেই। রুজিরোজগারের টানেও কেউ বেরোয়নি। মানবের কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল। পথেই দেখা হল মানবীর সঙ্গে। মানবীই তাকে এই ভয়ঙ্কর ভাইরাসের কথা শোনায়:

'... খুব ভয়ঙ্কর। সেই ভাইরাসের কোনও প্রাণ নেই, কিন্তু মানুষের শরীরের সংস্পর্শে আসতেই তার কাজ শুরু করে দেয় । কোনও ভাবে মানুষের নাক-মুখ,এমনকি চোখের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়লেই সোজা ফুসফুসে। ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে ফুসফুস।তাতে হয় মৃত্যু,নয়তো মৃত্যুর কাছাকাছি। সারা পৃথিবী তছনছ করছে এই ভাইরাস,লক্ষ লক্ষ মানুষ এর মধ্যে মৃত্যুর কবলে।'[৭]

মানব অনেকদিন রইল ফ্ল্যাটের ভেতর একা।প্রতিদিন তার ফ্ল্যাটের সামনে সাপ্লায়াররা খাবার রেখে যায়।ঊনচল্লিশ তলার ফ্ল্যাট থেকেই সে তার দৈনন্দিন জীবন-নির্বাহ করতে থাকে। একসময় মানবের খাবার আসা বন্ধ হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে টোটাল লকডাউন—ডেলিভারি বয়কে পুলিশ ঢুকতে দেয়নি। মানব ভীত হয়ে পড়ে; তা হলে কি না খেতে পেয়ে মরতে হবে? সারা পৃথিবীটা যেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে:

" 'পাশের এক ফ্ল্যাট থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, ' ওই দ্যাখো, মাথার উপরে আকাশটা আরও নীল হয়ে গেছে ,ওজনের ফুটো হয়ে যাওয়া স্তর আবার জুড়তে শুরু করেছে,কমে গেছে বাতাসের দূষণ,শব্দদূষণও তেমন নেই।' "[৮]

হঠাৎ মানবের কানে আসে হৈ চৈ কান্নার শব্দ। দরজা খুলে সে দেখতে পায় লিফটের পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে ফ্ল্যাটের লোকজন।বুড়ো-বুড়ি,পুরুষ-মহিলা ,সার দিয়ে নামছে সবাই। করোনা আমাদের কিছু ভুলে যাওয়া বিশ্বাসকে যেন আবার মনে করিয়ে দিল, যে একা মানুষ বাঁচতে পারেনা।এতদিন মনে হত উঁচু দামি ফ্ল্যাট,দামি গাড়ি,ব্যাঙ্কব্যালেন্স— এগুলো থাকলে সমস্ত সুখ বুঝি করায়ত্ত করা যায়। কিন্তু করোনা আমাদের মনে করিয়ে দিল মানুষ সামাজিক জীব, পারস্পরিক সাহায্যেই সে বেঁচে থাকে। করোনা মানুষকে আত্মসাক্ষাৎকারে বাধ্য করে । সে বুঝতে পারে সভ্যতার নামে এতদিন সে যা করেছে তা ক্রমশই তাকে পিছিয়ে দিয়েছে ।করোনা মানুষকে যেন নির্দেশ দিচ্ছে, মানুষের হাত ধরে এগোও, প্রকৃতির সঙ্গে থাকো, নাহলে মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। গল্পটি শেষ করেছেন লেখক এইভাবে:

'মানব কী এক ভয়ংকর নিঃস্বতা বুকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল কাঁপতে কাঁপতে। তারও জ্বর আসছে।রাত এখন অনেক। পরিযায়ী মানুষের মিছিল চলেছে সিঁড়ি বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে। নামছে তো নামছেই, এ এক অনন্ত অবতরণ। যে-মানুষ উঠেছিল সভ্যতার মই বেয়ে উপর থেকে আরও উপরে,এখন তাঁর নামার পালা।'[৯]

উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে 'পরিযায়ী' শব্দটি রয়েছে । 'পরিযায়ী'-র অর্থ 'যে পরিভ্রমণ করে' । ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়েও অনেক গল্প লেখা হয়েছে কোভিডের সময়ে। আসলে করোনা একপ্রকার সতর্কীকরণের সংকেত— যা একসময় নিঃশেষ করে দিতে পারে আমাদের সভ্যতার অহংকারকে।

'এখন বাড়িটার একদম উপরের তলা দেখতে গেলে ঘাড় অনেকখানি পিছন দিকে হেলাতে হয়। ...তাতেও আকাশঅচুম্বীর নির্মাণকাজ থামছে না এখনও। সভ্যতার গতি এরকমই অপ্রতিরোধ্য।মানব ইচ্ছা করলেও আর থামাতে অক্ষম।'[১০]

আকাশচুম্বী বাড়িটা লেখক সভ্যতার জয়যাত্রার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন:

'সামনের বেশ কয়েকটা বহুতল বাড়ির পিছনে দেখা যাচ্ছে তার আকাশচুম্বী বাড়িটা।সত্যিই যেন নীল আকাশ ফুটো করে দিতে চাইছে তার সর্ব্বোচ্চতল। তারও শিখরে বার করা হয়েছে লোহার খাঁচা, অর্থাৎ আরও উপরে উঠবে আকাশচুম্বীটা।কত উপরে মানব এখনও জানে না । সে নির্মাণ করে চলেছে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ,স্কাই ইজ দি লিমিট।নির্ঘাত কোনও একদিন ছুঁয়ে ফেলবে তার লক্ষ্য।'[১১]

একই সময় বাংলাদেশেও লেখা হয়েছে করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত গল্প। সেখান থেকে দুটি গল্পের দৃষ্টান্ত পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

বাংলাদেশের একটি গল্পসংকলনের নাম 'করোনা ও একটি অলকানন্দা ফুল'(প্রকাশক জলধি,ঢাকা;মার্চ ২০২১)।লেখক আদনান সৈয়দ। উনিশটি গল্পের মধ্যে দু'টি গল্পে এসেছে করোনার পরিস্থিতি। একটি গল্পের নাম 'বাবা'।পিতার করোনায় মৃত্যুতে কিশোরী কন্যার মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে।গল্পটিতে হাসপাতালের পরিবেশ বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণিত। রোগশয্যা থেকে পিতা কন্যাকে বলেছিলেন একটি নির্দিষ্ট জামা নিয়ে আসতে। কিন্তু মেয়েটি সেই জামা নিয়ে আসবার আগেই পিতার মৃত্যু হল।বাবার কবরে কন্যা সেই জামাটি রেখে দিল,দুর্বহ কষ্টের সাক্ষীরূপে।

এই লেখকেরই 'শবনম' গল্পে করোনাজনিত ট্রাজেডি অন্যভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এক চিকিৎসালয়ে মৃত্যু হয়েছে শব্নম নামে এক তরুণীর। তার প্রেমিক আশরাফ শব্নমের মৃত্যুর পর গল্পের কথককে দিয়ে গেল একটি চিরকুট।

হাসপাতালে এই কথকের সঙ্গে শব্‌নমের সাধারণ পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শব্‌নম তার একাকীত্বের মধ্যে তার প্রেমিক ছাড়াও এই কয়েকদিনের সহমর্মী পরিচিতজনকেও যেন পাশে রাখতে চেয়েছে। শব্‌নমের সেই চিরকুট হাতে নিয়ে ব্যক্ত হয়েছে গল্পের কথকের অনুভূতি :

" 'আমি কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজটা নিলাম। ঝাপসা চোখে সেই চিরকুটটি খুলে দেখি সেখানে মাত্র দুটো লাইন লেখা আছে। 'প্লিজ প্রে ফর মি। আমার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ' লাইন দুটো পড়ে আমি ফের চোখ বন্ধ করলাম।কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে দেখি দরজাটা খোলা। ততক্ষণে আশরাফ চলে গেছে। আমি তখনো অশ্রুসজল চোখে শক্ত মুঠোয় বন্দি করে রেখেছি সেই চিরকুট। এখনো যখন চোখ বন্ধ করি মাঝে মাঝেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই চিরকুটটি। স্পষ্ট দেখতে পাই সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে অক্ষরে লেখা রয়েছে কয়েকটি শব্দ।'প্লিজ প্রে ফর মি।আমার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে।' "[১২]

আর একটি গল্পসংকলনের নাম ' করোনা যুদ্ধের গল্প'। সম্পাদক তিনজন। অদ্বৈত মারুত,আশিক মুস্তাফা, মাহফুজুর রহমান মানিক। (অনার্য পাবলিকেশন্স লিমিটেড,ঢাকা,২০২০)। সেখান থেকে একটি গল্প তুলে ধরা হল। গল্পের নাম 'লাল মাস্কের আড়ালে'। লেখক মাহফুজ রিপন। করোনার সময়ে যে বস্তুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল সেটি হল মাস্ক। করোনা রোগ বাহিত হয় প্রধানত শ্বাস-প্রশ্বাস-এর মধ্য দিয়ে। সেই সময় চিকিৎসকদের নির্দেশ ছিল দুজন মানুষ খুব কাছাকাছি যেন না আসে। সেই সঙ্গে জনসাধারণ যেন রোগ প্রতিরোধের উপায় হিসেবে মাস্ক ব্যবহার করে। এই গল্পেই দরিদ্র পরিবারে করোনা কীভাবে অসহায়তা বৃদ্ধি করেছে তার চিত্র আছে। দরিদ্র দম্পতি শিশুসন্তানের নিউমোনিয়ার ওষুধ কেনবার জন্য বেরিয়েছে। কিন্তু চারিদিকে করোনা,তাকে মাস্কও কিনতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাকে মাস্ক কিনতে হল কারণ মাস্ক না পরলে পুলিশে শাস্তি দেবে। দরিদ্রের সেই বিপন্নতা গল্পটিতে ব্যক্ত হয়েছে:

'সে ওষুধ না কিনে মসজিদের সামনে থেকে ত্রিশ টাকা দিয়ে একটি লাল রঙের মাস্ক কিনে মুখে পরলো। তারপর স্ত্রীর কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করল বাড়ির দিকে। ... আমি দূর থেকে পরিবারটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।কিন্তু মাস্ক এবং বোরকায় তাদের মুখ ঢাকা ছিল—তাই দুজনের কোনও অনুভূতি চোখে পড়ল না। লোকটার সমস্ত দুঃখ আড়াল হয়ে গেল তার মুখের লাল রঙের মাস্কে।' [১৩]

নিবন্ধ শেষ করবার আগে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি বিশেষ ধরনের সংকলন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ফেসবুক মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম। ফেসবুকে অনেকেই নিজেদের মনের কথা লিখে রাখেন। বাংলাদেশ থেকে একটি সংকলন সম্পাদনা করেছেন আনোয়ারা আজাদ (অন্বয় প্রকাশ,বাংলাবাজার,ঢাকা,২০২১)। এই সংকলনের নাম 'ফেসবুকে কোভিড১৯'। ফেসবুক থেকে গৃহীত কিছু কিছু লিখনের সমাহার। এগুলি প্রথাসিদ্ধ ছোটোগল্প নয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ দিক থেকে দেখলে এই উপলব্ধিই ছোটোগল্পের উপাদান। অবশ্যই এগুলিকে বলা যায় মুক্তগদ্য। সেইসঙ্গে কোনও কোনও উদাহরণকে অণুগল্প বলতেও বাধা নেই। একটি নমুনা উদ্ধৃত হল। লেখকের নাম জুয়েল আহসান কামরুল:

' গতকাল সন্ধ্যের পর প্যারিসে কথা হলো,মামা-মামির সঙ্গে।তাঁরা বহুদিন যাবৎ লকডাউন হয়ে আছেন।মামা বললেন,রাত্রি আটটা বাজতে যাচ্ছে...

আমি জানতে চাইলাম,তাতে কী হয়েছে?

তিনি বললেন,আমরা এখানে রাত্রি আটটা বাজলেই সকলে সকলের ঘরের জানলা থেকে করতালি দিই এবং যে যার মতো করে দোয়া করি।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম,কেন? কার জন্যে?

বললেন,ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্যে; যাঁরা নিজের জীবন বাজি রেখে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা করছেন,সেবা করছেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম! কী বলব ভাষা খুঁজে পেলাম না...'[১৪]

মানবসমাজে বিভিন্ন সময়ে বারবার বিপর্যয় এসেছে। বাঙালির জীবনেই আমরা দেখেছি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, দাঙ্গা। দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অনেক মানুষ অর্জন করেছেন। সাহিত্যে এইসব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে চিরকাল—এদেশে ও বিদেশে । মহামারিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হয়েছে অনেক। বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত নিদর্শন হল আলবেয়ার কামুর লেখা 'দ্য প্লেগ'(পেঙ্গুইন বুকস্, লন্ডন,১৯৬০)। যুগে যুগে এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বিশেষভাবে প্লেগ ইউরোপে হানা দিয়েছে বারবার। তাই প্লেগ নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাসের সংখ্যাও বেশি। আবার কলেরা মহামারি নিয়ে লিখেছেন অনেকেই। যেমন ,'লাভ ইন দ্য টাইম অব্ কলেরা' ,লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ,(বোরজই বুক পাবলিশার্স,নিউ ইয়র্ক,১৯৮৮)। সেই সঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি কোভিড১৯ নিয়ে একটি গল্পসংকলনের কথা, যা প্রকাশিত হয়েছে আফ্রিকা থেকে। সংকলনটির নাম 'কোভিড স্টোরিস ফ্রম ইস্ট আফ্রিকা অ্যান্ড বিয়ন্ড'। সম্পাদনা করেছেন তিনজন—১) মেরি নেজেরি কিনইয়ানজুই,২) রুপল থ্যাকার,৩) ক্যাথরিন টাউরে(ল্যাংগা রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিশিং,ম্যানকন,আফ্রিকা,২০২০)।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই মহামারি কীভাবে বিশ্বসাহিত্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। বর্তমান নিবন্ধে ,বাংলা ছোটোগল্পে কোভিড১৯-এর এই চিত্রণ সেই বিশ্বসাহিত্য-ধারারই অন্তর্গত।

উল্লেখপঞ্জি

১.পূততুণ্ড সায়ন্তনী, 'কোভিড সমাচার বাই কমলি' শারদীয় কথাসাহিত্য-১৪২৭,কলকাতা,পৃষ্ঠা-১৫৪
২.তদেব,পৃষ্ঠা ১৫৪
৩.তদেব,পৃষ্ঠা ১৫৪,১৫৫
৪.তদেব,পৃষ্ঠা ১৫৮
৫.গোস্বামী সমীর, 'সজিওয়ালার ছেলে', আজকাল শারদ১৪২৮,আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা,পৃষ্ঠা২৬০
৬.বন্দ্যোপাধ্যায় তপন, 'শেষ দৃশ্যের খসড়া' উশ্রী ২০২১,সুরসপ্তক,গিরিডি,পৃষ্ঠা ৩৩
৭.তদেব,পৃষ্ঠা ৩৪
৮.তদেব,পৃষ্ঠা ৩৭
৯.তদেব,পৃষ্ঠা ৪০
১০.তদেব,পৃষ্ঠা৩৩
১১.তদেব,পৃষ্ঠা৩৬
১২.সৈয়দ আদনান, 'শব্নম' করোনা ও একটি অলকানন্দা ফুল,জলধি,ঢাকা,২০২১, পৃষ্ঠা ৩২/৩৩
১৩.রিপন মাহফুজ, 'লাল মাস্কের আড়ালে', করোনা যুদ্ধের গল্প,সম্পাদক-মারুত অদ্বৈত,মুস্তাফা আশিক,মানিক মাহফুজুর রহমান, অনার্য পাবলিকেশন্স লিমিটেড,ঢাকা,২০২১,পৃষ্ঠা ১৭৩
১৪.এই লিখনগুলিতে লেখকের নাম থাকলেও কোনও শিরোনাম নেই। কামরুল জুয়েল আহসান, ফেসবুকে কোভিড উনিশ,সম্পাদনা-আনোয়ারা আজাদ,অন্বয় প্রকাশ,বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০২১,পৃষ্ঠা ।